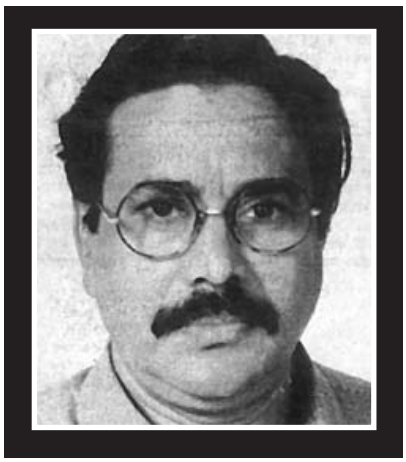

আবিদ আজাদ
আমাদের অন্তরযাত্রী

আবিদ আজাদ, ডান থেকে দ্বিতীয়

লিখেছেন **মাহবুব হাসান**

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কবিরে পাবে না, তাহার জীবনচরিতে।' কথাটা কতোটা সত্য আর বাস্তব তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কবি যদিও বাস্তবে হুবহু আঁকেন না, যা আঁকেন, তা বাস্তবের মতো, চেনাদৃশ্যের কাছাকাছি। আর সেই চেনাজগতের পরিপার্শ্বে থাকেন কবি। এই সত্য কেন রবীন্দ্রনাথ গোপন করেছেন, তা আমার বোধে অগম্য। তবে, আমার প্রিয় কবি ও প্রিয় বন্ধু আবিদ আজাদের অকাল প্রয়াণ যতটা ব্যথিত করেছে তারও চেয়ে বেশি বিস্মিত আমি তার কবিতার চিত্রকল্পময় রহস্য দেখে এবং চোখে।

কবি যে চেনা জগতের পরিবেশ প্রতিবেশকেই কল্পনার রঙে মিশিয়ে নতুন কিছু নির্মাণ করেন, নতুন দৃশ্যচিত্র নির্মাণ করে নতুন কিছু বলতে চান, সেই খবর সুপাঠকদের সবারই জানা। আবিদ আজাদ যখন লেখেন, 'শুকনো হাওয়ায় মনে পড়ে নিউটাউন... নিউটাউন../ ঘুমের ভেতরে এখনো কিশোরগঞ্জ, গরুগাড়ি/সূর্যাস্ত পিছনে ফেলে যায় ফোঁসা, খড়, হাঁটবার/অনাথবাবুর বাড়ি, ভাঙাঘাট, দেয়াল.../ দেয়াল....' 'শুকনো হাওয়ায়' কবিতায় আবিদ আজাদের নিউটাউনের বাড়িটির ছবি মনে অস্পষ্ট ভেসে ওঠে। গ্রাম থেকে উঠে আসছে একটি পরিবার গরুর গাড়িতে করে এবং ফেলে আসছে প্রিয় মানুষ আর আজন্মের পরিবেশ ইত্যাদি। ইস্কুল ঘরের চাল, ঢেউটিন, বেঞ্চি, সারি সারি শূন্যস্থান, ব্লাকবোর্ড, খিড়কির কপাট, চকখড়ি দিয়ে আঁকা মুখ, নামতার ঘর, কাঁচা হাতে লেখা নাম- সে কোন পাঠক অস্বীকার করবেন? না, প্রায় প্রত্যেক মানুষ, যার শেকড় পোতা আছে গ্রামে- আবিদ আজাদের বর্ণনা পড়ে মুহূর্তে ডুবে যাবেন মধুময় স্মৃতিরবাস্তবে। সেই বাস্তব আজ আর নেই। কিন্তু সেই বাস্তব ছিল। আজ তার ধারাবাহিক রূপান্তরিত বাস্তব নিউটাউনে জ্বল্যমান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবিদ তার সেই কৈশোরকে বাস্তবেই রহস্যময় ঢঙে নির্মাণ করেছেন।

রেণু... রেণু ডাক শুনে যেন
নিরালা নির্জনতার মুখ তুলে ধরলো শুকনো পাতা...

এইভাবে সারা পথ, এইভাবে পিছে ফেলে আসা...

কবি তার গ্রাম পিছে ফেলে কিশোরগঞ্জের নিউটাউনে এসে বাস্তু গেড়েছিলেন। সেখানে রেণুর গহন থেকে বেরিয়ে আবিদ এসেছিলেন ঢাকায়, সত্তর সালে। জেলা শহর ছেড়ে প্রাদেশিক শহরে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের রাজধানীতে। পিছনে ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকিয়েছে কবি তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো, বোঝা যায়। তিনি স্বীকার করেছেন সে কথা। '১৯৭০ সাল। আমি পা রাখলাম এক স্তব্ধতা থেকে আরেক তপ্ত স্তব্ধতায়। কম্পমান একটা শিশিরের মতো এক ছোট্ট মফস্বল থেকে এসে পড়লাম মস্ত শহরে। এই ঢাকা শহর তখন আমার কাছে জরি-চুমকির মতো ঝলমলে কবিতার রাজধানী।'

[আমার কথা/কবিতা সমগ্র]

পিছনে ফেলে আসার কাহিনী কিভাবে আবিদ আজাদের স্মৃতিসত্তায় জেগেছিলো এই স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ। বাইরে যা কিছু দেখি, অবলোকন করি- ভিতরে বসে রঙবেরঙের টুকরো রঙিন নিজের কাচে ফেলে ছকে ছকে মিলাই; মজে যাই ব্যবচ্ছেদ। স্মৃতি হয়ে ওঠে আমার প্রধান আহার্য।'

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আবিদ আজাদ স্মৃতিসত্তার রূপকার ছিলেন। যাপিত জীবন আর কল্পনার জীবন এই দুই প্রেক্ষিতের সত্য নতুন সত্য নির্মাণ করে, যা প্রতীকী বাস্তবতা। আবিদ আজাদকে আমি বলি চিত্রকলাময় কবি। এজরা পাউন্ড কথিত 'চিত্রকল্পই কবিতা'র রহস্যপট যেন বাংলা কবিতায় জীবনানন্দীয় অন্তর থেকে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে এসে মিশেছে আবিদ আজাদের চেতনার মোহনায়।

এ কথার পক্ষে দু'একটি উদ্ধৃতি দেয়া যাক।

ক. ঠিক যেন আমার বাবা, বসেছেন পা ছড়িয়ে মেঝেয়
সামনে কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ...
একেকটা উঁইপাকায় কাটা পাহাড়
মাঝখানে দোয়াতের ল্যাম্প থেকে/উঠছে কেরোসিনের শিষ
আর সারা ঘরে ছড়ানো ছিটানো
আমরা ক'জন ভাইবোন।
[মনে পড়লে কবিতা সমগ্র]

খ. বুক থেকে অবিস্মরণীয় মৌনতার লতাতন্তু ঝরাতে ঝরাতে চলে গেছ তুমি।
আমি পড়ে আছি অপাঙ্গেবিদীর্ণ হতশ্রী বাড়ির মতা একা আকণ্ঠ বিহারী।
এই একা আমি শুভ্র নির্জনতাধৌত পথের রেখা পাশে পড়ে আছি
অনুজ্জ্বল আরেকটি ম্লান রেখা শুধু।
[আজো তুমি/কবিতা সমগ্র]

গ. বৃষ্টি নামল কামরুল হাসানের জাবদা

খাতায়
বৃষ্টি নামল বুক সেন্টারের চতুষ্কোণ ঘাসের কার্পেটে
বৃষ্টি নামল রোউফের তুলির আঁচড়ে
বৃষ্টি নামল কায়সুল হকের কালো মসৃণ চামড়ার ব্যাগে
বৃষ্টি নামল তরুণ কবির বুক পকেটের নির্মম বাঁ পাশে
বৃষ্টি নামল চিকন যুবকের নিঃসঙ্গ সানগ্লাসে, গাড়ির বনেটে
বৃষ্টি নামল এয়ারপোর্টের মতো মহিলার রঙচটা ঠোঁটে
টাপুর টুপুর টাইপরাইটারের শব্দে বৃষ্টি নামল সারা মতিঝিলে।
[বৃষ্টি/কবিতা সমগ্র]

তিনটি কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করার পর একবারও মনে হয় না যে আবিদ আজাদ এই আপাত বৈসাদৃশ্যকে মিলাতে চান কোন লক্ষ্যে। এই কবিতা তিনটির মধ্যে অন্তর্গত মিল একটাই, তাহলো এগুলো আকরণ শৈলী। টানা গদ্যে না বলে বলা উচিত প্রবহমান মুক্তকে আবিদ আজাদ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কারণ আবিদের চেতনার প্যাটার্ন নির্মিত হয়ে গিয়েছিল টানা গদ্য ফর্মে নিজেকে প্রকাশের। যদিও তার আকরণ কলায় রয়েছে মাত্রাবৃত্তের মোহন কারুকাজ, রয়েছে অক্ষরবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের কাজ। এ ছাড়াও তার আকরণ ধারায় দীর্ঘবাহুর চিত্রময়তা পাঠকের মনে যে জটিলতা সৃষ্টি করে, তার অভিঘাত তাঁর স্মৃতিসত্তার অন্যতম উদাহরণ। যে তিন টুকরো কবিতা পঙ্‌ক্তি উল্লিখিত হয়েছে সেখানে কবির জীবনবাস্তবের শ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। উদ্ধৃত- 'ক'তে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে নিমগ্ন বাবা, দোয়াতের ল্যাম্প, আর সেই আলো-আঁধারির জগতে 'আমরা ক'জন ভাইবোন' আবিদ আজাদের আজন্ম চেনা। এই দৃশ্যকল্প কি করে অস্বীকার করবো আমরা? রবীন্দ্রনাথ কি করে চলমান জীবন জগৎ পরিবেশ-প্রতিবেশে এমন ধারাবাহিকতাকে উড়িয়ে দেবেন? আসলে রবীন্দ্র যুগের চেয়ে এখনকার মানুষ বেশি জীবনঘনিষ্ঠ। প্রতিদিনকার ঘটমান বাস্তবকেই লৌকিক প্রতীতির পাটাতনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নির্মাণ করে নতুন প্রেক্ষণ, নতুন বীক্ষণ চেতনা।

শুধু আবিদ আজাদের কবিতায় নয়, যে জিনিসটি আমি সাত-এর দশকের কবিতায় লক্ষ্য করেছি, তাহলো, লোকজন প্রতীতি বা আমাদের 'আবহমান বাংলার পরম্পরাকে নতুন ঢঙে পরিবেশন এবং নতুন প্রকরণ-প্রভা নির্মাণের প্রয়াস। আমি নিজে একটি কবিতায় লিখেছি 'মেঘের গ্রিল থেকে চঞ্চল পরে' ইত্যাদি। অলৌলিক বাস্তবকে বা অস্পর্শযোগ্য উপাদান উপকরণকে লোকমানসের নিত্য বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে

তিনটি কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করার পর একবারও মনে হয় না যে আবিদ আজাদ এই আপাত বৈসাদৃশ্যকে মিলাতে চান কোন লক্ষ্যে। এই কবিতা তিনটির মধ্যে অন্তর্গত মিল একটাই, তাহলো এগুলো আকরণ শৈলী। টানা গদ্যে না বলে বলা উচিত প্রবহমান মুক্তকে আবিদ আজাদ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কারণ আবিদের চেতনার প্যাটার্ন নির্মিত হয়ে গিয়েছিল টানা গদ্য ফর্মে নিজেকে প্রকাশের। যদিও তার আকরণ কলায় রয়েছে মাত্রাবৃত্তের মোহন কারুকাজ, রয়েছে অক্ষরবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের কাজ

অর্থাৎ মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে নতুন চিত্রকলা নির্মাণ করা। আবিদ এ ক্ষেত্রে সিদ্ধি অর্জনকারী কবি।

সেই প্রথম আমি যখন আসি
পথের পাশের জিগা গাছের ডালে তখন চড়চড় করে উঠছিল রোদ
কচুর পাতার কোষের মধ্যে খন্ড খন্ড রুপালি আগুন
ঘাসে ঘাসে নিঃশব্দ চাকচিক্য-ঝরানো গুচ্ছ গুচ্ছ পিচ্ছিল আলজিভ

এ কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে চিত্রের সমাহার। এর প্রতিবেশটি গ্রামীণ পটের। জিগা গাছের ডালে রোদ চড়চড় করে উঠছিল এটি কবির কল্পনা। রোদতপ্ত দিনে যে কেউ জিগার ডালে ডালে রোদ দেখতে পাবে। আবার কচুর পাতার কোচে আবিদ আজাদ দেখতে পেয়েছেন খন্ড খন্ড রুপালি আগুন। আর ঘাসের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ আলজিভ। ঘাসের মধ্যে আলজিভ লক্ষ্য করার মধ্যে যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, তা আবিদ আজাদের নিত্যপ্রবহমান চেতনারই ফল। তাঁর অদ্ভুত চিত্রকল্পময় কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করি, যা আবিদের অনন্য চেতনার চিহ্ন হিসেবে পরিচয় দেবে।

ক. অজস্র লিফলেটের মতো উড়তে থাকা ধবল বকের ভিতরে ভীষণ উঁচু উঁচু নলখাগড়ার ঝোপে
ছোট সেই ছই নৌকার পাটাতনে তছনছ পাখির মতো
[সে/কবিতা সমগ্র]

খ. পার্কের ঝরাপাতার ওপর সারারাত ধরে শিশিরে ভিজে যাবে মৃত তরুণীর হাঁটুর ভাঁজ।
[যে শহরে আমি নেই থাকব না/ কবিতা সমগ্র]

গ. বেইলি রোডের সুনসান গলা, নিঝুম ঝাঁঝালো কোকাকোলা
[এলিজি : আবুল হাসানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে/ কবিতা সমগ্র]

ঘ. হে প্রভু, দেখুন সন্ত্রস্ত একটি মুরগির বাচ্চার মতো কেমন চিঁ- চিৎকারে
এই আমি আটকে গেছি তার সৌন্দর্যের অনিবার্য নীল নখে-
[তরুণ মৌলভি : একজন মহিলার প্রতি/কবিতা সমগ্র]

ঙ. ঘরের ফুসফুস ভরে ওঠে উত্তুরে হাওয়ায়।
[তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?/কবিতা সমগ্র]

চ. আমার নিঃসঙ্গ কোলে তুই এক নতুন সকাল;
'বাবা, বাবা' বলে যেই টেনে ধরিস আমার হাত
মনে হয় ফুটে ওঠে শিশিরার্দ্র গোলাপের লাল
পাপড়ির আভার মতো সেই দেশ স্বপ্ন যার নাম।
[কন্যাকে/কবিতা সমগ্র]

চিত্রগুলোর কল্পনার রঙে এমন অনির্বাচনীয় হয়ে উঠেছে যে আবিদের কবিতা পড়ে ওর মনের কোষে কোষে দৃষ্টি দেবার কথা ইচ্ছে জাগে পাঠকের। কারণ পাঠকের চেতনায় আবিদ রচিত চিত্রভাষ্যটি ছিল না। তাই লোভ হয়, দু'চোখ মেলে দেখি, আসল না নকল ওই চিত্রকল্পনা।

সাত-এর কবিতায় লোকবাংলা প্রতিবেশ আর উপাদান উপকরণ আর আমাদের ঐহিত্যের যে লতাগুল্ম রয়েছে তার ব্যবহার ধীরে ধীরে বেড়েছে এবং তার একটি প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। আবিদ সেই ধারাস্রোতেরই এক কারিগর। আমাদের স্মৃতি-মজ্জায় পরস্পরের বোধসত্তা এমনভাবে শুয়ে থাকে আর এমনভাবে তার ব্যবহার কবিতায় ঘটে যে মনে হয় না তা আরোপিত। যেন তা নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসের অন্তর্গত। আবিদ আজাদের কবিতার জালে ধরা পড়েছে সেই সব পরম্পরা রুপালি ইলিশের মতো। কবিপ্রাণ কখনোই তার জীবন পরিবেশ-প্রতিবেশের বাইরে যান না। কারণ তার স্মৃতিসত্তায় বস্তুবাস্তব আর স্মৃতিবাস্তবের মধ্যে নিয়তই Interaction চলতে থাকে। সেই মিথস্ক্রিয়ায় রচিত ফল্গুই তাকে চিত্রিত করে তার জনপদের, মৃত্তিকার সম্পদ হিসেবে, জীবনশিল্পী হিসেবে। আবিদ আজাদ সেই শ্রেণীর শিল্পী, যাকে আমাদের অন্তরসম যাত্রী হিসেবে আমি বিবেচনা করি। সাত-এর কবিতার প্রধান ফল্গু হিসেবেই আবিদ বিবেচিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ আমার অন্তত নেই।

২৮ মার্চ, ০৫, ঢাকা